HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০১ বর্ণবাদের ধারণা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বর্ণবাদের ধারণা

টপিক ০২: বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

টপিক ০৩: বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

টপিক ০৪: বর্ণবাদী গণহত্যা ও নির্যাতন

টপিক ০৫: বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

টপিক ০৬: বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বর্ণবাদের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বর্ণবাদের ধারণা

সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণবাদ এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। অতীতের ক্রীতদাস প্রথার জন্য এ অমানবিক মূল্যবোধ অনেকাংশেই দায়ী। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা একসময় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে যে ঔপনিবেশিক শাসন ও নির্যাতন চালিয়েছে তার পেছনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবাদী মানসিকতা ও বিশ্বাস জড়িয়ে ছিল। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে উনিশ ও বিশ শতকে বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে জাতিসংঘ বর্ণবাদকে নিষিদ্ধ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদবিরোধী কঠোর আইন প্রণীত হতে থাকলে একুশ শতকে এসে বিশ্ব বর্ণবাদের অভিশাপ থেকে অনেকটা মুক্ত হয়।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে বিশ্বের অসংখ্য মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এ আন্দোলনকে একটি সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভারতের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী), যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা ও ডেসমন্ড টুটু প্রমুখ। এই মহান ব্যক্তিদের দক্ষ ও উদ্দীপনামূলক আন্দোলনের ফলেই বিশ্বে আজ বর্ণবাদের কলঙ্কিত অধ্যায়ের সমাধি ঘটেছে।

বর্ণবাদের ধারণা

সাধারণভাবে বললে মানুষকে দৈহিক গঠন, ত্বকের রং, ধর্ম, জাতি বা গোষ্ঠীগত পরিচয়, আবাসস্থল ইত্যাদির বিচারে বিভক্ত করে উঁচু বা নিচু হিসেবে শ্রেণিকরণের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের তারতম্য করাই বর্ণবাদ (Racism বা Racialism) |

ইংরেজি 'Race' থেকে 'Racism' বা Racialism শব্দের উদ্ভব যার বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে বর্ণবাদ। ১৯০৭ সালের অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 'Racialism' কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে- 'Belief in the superiority of a particular race. (বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস)। 'Racism' শব্দটি তখন ওই অভিধানে ছিল না। ১৯৩০-এর দশকে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 'Racism' শব্দটি প্রথম উল্লেখ করা হয় এবং সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে- 'The theory that distinctive human characteristics and abilities are determined by race” অর্থাৎ বর্ণবাদ হচ্ছে এমন একটি ধারণা যাতে বলা হয়, মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ নির্ধারিত হয় তার বর্ণগত পরিচয়ের দ্বারা। ১৯৩৬ সালে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 'Racism' বা 'Racialism' শব্দদ্বয়কে প্রতিশব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৩ সালের ২৬ মার্চ 'Die Burger' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম বর্ণবাদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'Apartheid' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। "Apartheid' শব্দের অর্থ হলো জাতিবিদ্বেষ। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল পার্টির সদস্য ড. ম্যালান 'নতুন প্রজাতন্ত্র' সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

বর্ণবাদের ধারণা

বর্ণবাদের একেবারে নিখুঁত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। কেননা বিশেষজ্ঞরা মানবজাতির 'Race' বা প্রজাতি সংক্রান্ত সংজ্ঞায় একমত হতে পারেননি। জীববিজ্ঞানের ভাষায়, বর্তমান পৃথিবীতে যে মানবজাতি বাস করছে তারা হোমো স্যাপিয়েন্সের (Homo Sapiens) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতির দৈহিক বৈশিষ্ট্য যেমন- চোয়ালের গঠন, মাথার খুলির আকৃতি, হাড়ের গড়ন, উচ্চতা, চুলের রং, চোখের মণির রং, ত্বকের রং, পৃথিবীর সব অঞ্চলে এক নয়। কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ লালচে ত্বকের অধিকারী। কেউ বেশ লম্বা, কেউ মাঝারি উচ্চতার কেউবা আরও খর্ব। কারও নাক খাড়া, কারও নাক চ্যাপ্টা। কারও চুল ঘন কালো, আবার কারও চুল বাদামি কিংবা সোনালি। কোনো গোষ্ঠীর মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই পেশীবহুল সুঠাম দেহের অধিকারী আবার কেউবা তুলনামূলকভাবে ক্ষীণদেহী। কেউ কেউ সহজেই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, আবার অনেকে নেতৃত্ব দেয়ার পরিবর্তে অনুসরণ করাতেই বেশি আগ্রহী।

বর্ণবাদের ধারণা

মানুষের মধ্যে এই যে দৈহিক ও মননগত পার্থক্য এগুলোকে ভিত্তি করেই কোনো কোনো সমাজে মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে উন্নততর বা নিম্নতর জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে যুগ যুগ ধরে একদল অপরদলকে পদানত, শোষণ, নির্যাতন করেছে। অথচ জীববিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তত্ত্ববিদদের মতে এভাবে মানুষের মাঝে শ্রেণিবিভাজন করা অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। এ বিষয়ে জাতিসংঘ সনদের মতে, "জাতিগত বৈষম্য এবং নৃতাত্ত্বিক বৈষম্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জাতিগত পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্রান্ত, নৈতিকভাবে নিন্দনীয়, সামাজিকভাবে অন্যায় ও ক্ষতিকর। তাত্ত্বিক কিংবা বাস্তব জীবন কোনো ক্ষেত্রেই জাতিগত বৈষম্যকে মেনে নেয়া যায় না।”

বর্ণবাদের ধারণা

মানবজাতির মধ্যে অবশ্যই শারীরিক গঠনগত ভিন্নতা রয়েছে। উনিশ শতকে বিজ্ঞানীরা মানবজাতিকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে (উচ্চতা, ত্বকের রং, খুলির আকৃতি, চোয়ালের গঠন, নাকের গঠন, চুলের রং) কয়েকটি প্রজাতিতে বিভক্ত করেন। যেমন- অস্ট্রালয়েড, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, নিগ্রোয়েড, মঙ্গোলীয় ও ককেশীয়। এ শ্রেণিবিভাগের ওপর ভিত্তি করে এক শ্রেণির তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ যুক্তি দেখান যে, মানুষের কোনো কোনো প্রজাতি অবশ্যই অন্য প্রজাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর কেউ কেউ উন্নততর বলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারগুলো সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। এ শ্রেণির ব্যক্তিরা মনে করেন, কিছু কিছু অধিকার অবশ্যই কথিত শ্রেষ্ঠ প্রজাতির জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত। এ বিশ্বাসের ফলে কোনো কোনো কাজ নিচু প্রজাতির বলে চিহ্নিত মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়। আফ্রিকা এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে সাদা চামড়ার মানুষেরা কালো চামড়ার মানুষদের অধস্তন হিসেবে চিহ্নিত করে দাসে পরিণত করে বা অন্যভাবে শোষণ-নির্যাতন করে। রাষ্ট্রীয় আইন ও সমাজস্বীকৃত প্রথার মাধ্যমে এ শোষণ-নির্যাতন চালানো হয়।

বর্ণবাদের ধারণা

ইউরোপের বিশ শতকের আলোচিত নেতা এডলফ হিটলার জার্মান জাতিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তিনি ইহুদিদের নিম্নশ্রেণির আখ্যা দিয়ে তাদের জার্মানি তথা ইউরোপ থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও যদ্ধকালীন সময়ে হিটলারের নাৎসি বাহিনী ইউরোপের ইহুদি জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি অংশকে হত্যা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত 'হলোকাস্ট' নামে পরিচিত গণহত্যায় প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। এ ধরনের জাতিগত বিদ্বেষ বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে এলেও যখন বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিকতা চরম পর্যায়ে ওঠে তখন তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এক পর্যায়ে জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'জাতিপুঞ্জ' গঠিত হলে জাপান বিষয়টি সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের আইনে সুস্পষ্ট উল্লেখের দাবি জানায়। তবে ব্রিটেনের বিরোধিতায় তখন দাবিটি গৃহীত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণার মাধ্যমে সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্যের অবসান কামনা করে।

বর্ণবাদের ধারণা

১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রথম ২১ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক জাতিগত বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস' হিসেবে পালনের আহ্বান জানায়। ২০০১ সালে জাতিগত ভেদাভেদ ও বর্ণবাদ বিরোধী বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে বর্ণবাদ বিরোধী আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসব সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বর্ণবাদ সমস্যাকে দূরীভূত করা এবং নতুন করে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি আদায় করা। দাসপ্রথার অবসান ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কুখ্যাত বর্ণবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন হলেও বিশ্ব থেকে বর্ণবাদ এখনো পুরোপুরি দূর হয়নি। বিশ্বের কোনো কোনো সমাজে একুশ শতকেও বিভিন্ন মাত্রায় এটি দেখা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০২ বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

বর্ণবাদ (Racism)-এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। জাতিসংঘ বর্ণবাদের সংজ্ঞার পরিবর্তে বর্ণবাদী বৈষম্যের সংজ্ঞা প্রদান করে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রবণতা দেখা গেছে। বর্ণবাদী বৈষম্য বলতে জাতিসংঘ তার কনভেনশনে উল্লেখ করেছে, "....the term 'Racial Discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life." (বর্ণবাদী বৈষম্য বলতে জাতিগত গোষ্ঠী, গায়ের রং, বংশ, জাতীয়তা কিংবা নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের কারণে যেকোনো প্রকার বিভেদ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বাড়তি সুযোগ প্রদান কিংবা সুযোগ অপসারণের মাধ্যমে রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিকসহ জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে সবার একই রকম মানবিক ও মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা অস্বীকার করাকে বোঝাবে)। ব্রিটিশ আইনে জাতিগত গোষ্ঠী, রং, জাতীয়তা বা নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের কারণে মানুষকে দলে বা গ্রুপে বিভক্ত করাকে বর্ণবাদরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

কতিপয় সমাজতাত্ত্বিক বর্ণবাদকে শ্রেণিগত সুবিধাপ্রাপ্তির একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড ওয়েলম্যান (David Wellman) এর মতে, “বর্ণবাদ হলো সংস্কৃতিসিদ্ধ বিশ্বাস যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্বেতাঙ্গরা অধস্তন প্রজাতির মানুষের ওপর সুবিধা লাভ করে।" সমাজতাত্ত্বিক নোয়েল এ ক্যাজেনেভ এবং ডারলেন আলভারেজ ম্যাডার্ন (Noel A. Cazenave and Darlene Alvarez Maddern) এর মতে, “বর্ণবাদ হলো বর্ণের ভিত্তিতে শক্তভাবে সুসংগঠিত সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীব্যবস্থা যা সমাজের প্রতিটি স্তরে সক্রিয়। গাত্রবর্ণ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের এক সূক্ষ্ম ও বিধিবদ্ধ ধারণা একে টিকিয়ে রেখেছে”।

বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদ

আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় বর্ণবাদের অবসান ঘটলেও বিশ্বের অনেক দেশে বিভিন্নমাত্রায় বর্ণবাদ এখনো প্রচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবাদ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য বর্ণবাদীরা সংখ্যায় কম। উন্নত মানবাধিকার ও চরম ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ থেকে আনুষ্ঠানিক বর্ণবাদী ব্যবস্থা পঞ্চাশের দশক থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে। বর্তমানে গায়ের রঙের ভিত্তিতে বৈষম্য করা সেখানে বড় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তবে মার্কিন সমাজে কৃষ্ণাজাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব একেবারে দূর হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাজাদের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণের বহু অভিযোগ পাওয়া যায়। জনসংখ্যার তুলনায় বিভিন্ন অভিযোগে কারাগারে আটক কৃষ্ণাঙ্গের হার অনেক বেশি। লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড প্রিজন ব্রিফের দেয়া তথ্য মতে, কয়েদি সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সবার ওপরে।

বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলন

বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

দেশটির জেলখানাগুলোয় ২০ লাখের বেশি কয়েদি রয়েছে, যা ওয়াশিংটন ডিসি, মায়ামি ও বোস্টনের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই কৃষ্ণাঙ্গ। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ দ্বারা জর্জ ফ্লয়েড নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটলে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে। জর্জ ফ্লয়েড, ব্রেওনা টেইলরসহ অনেক কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার শিকার হয়েছেন, যা বিশ্বজুড়ে জাতিগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে। 'Black Lives Matter' নামে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এ সামাজিক চিত্রের তীব্র সমালোচক আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট জো ফিগিন (Joe Feagin) বলেছেন, 'মার্কিন সমাজকে পুরোমাত্রায় বর্ণবাদী সমাজ বলা যেতে পারে।'

বর্ণবাদের আইনগত সংজ্ঞা

সিএনএন নিউজের এক সম্প্রচারে মার্কিন কলামিস্ট নিকোলাস ক্রিস্টোফের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়, ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে শ্বেতাঙ্গ যুবকদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক নিহত হয়েছে একুশ গুণ বেশি।' ক্রিস্টোফের গবেষণায় দেখা যায়, ২০১০-২০১২ সময়কালে পুলিশের গুলিতে ১৫-১৯ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ মৃত্যুর হার ছিল প্রতি মিলিয়নে ৩১.১৭জন। অপরপক্ষে, শ্বেতাঙ্গ মৃত্যুর হার ছিল প্রতি মিলিয়নে মাত্র ১.৪৭ জন।

শত শত বছর ধরে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীরা আফ্রিকা, আমেরিকা এবং এশিয়ায় তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য যুক্তির পাশাপাশি গাত্রবর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলত। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ কয়েকটি দেশে এক সময় বর্ণবাদ এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, দৈনন্দিন জীবনযাপনকেও তা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করত। ২০১১ সালে পুলিশের গুলিতে মার্ক ডুগান নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি নিহত হলে সে সময় লন্ডন বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয় ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশে দেশে বর্ণবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ জীবনযাপন, সমাজ, সংস্কৃতি, রেস্তোরাঁয় খাওয়া, বিদ্যালয়ে পড়াশোনা, ফুটপাতে চলা, বাস-ট্রেনে চড়া, সিনেমা হলে ছবি দেখা ইত্যাদির মতো অনেক ক্ষেত্রে সাদা ও কালো মানুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। দীর্ঘ আন্দোলনের পর সেই পরিস্থিতির অবসান হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০৩ বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বর্ণবাদের মতো অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই মানব সমাজে প্রচলিত ছিল। গবেষক এডিথ স্যানডারস প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, নোয়া এর তিন সন্তানের মধ্যে একজন ছিলেন 'হাম' যিনি ছিলেন অভিশপ্ত। এই হামের বংশধররাই অভিশাপের কারণে কালো হয়ে জন্ম নেয়। আর তারাই হচ্ছে আফ্রিকার কালো মানুষ।" 'এভাবে প্রাচীনকাল থেকেই গায়ের ত্বকের রং-কে স্রষ্টার অভিশাপের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করে কালো চামড়ার মানুষদের ওপর সাদা চামড়ার মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব দানের প্রবণতা লক্ষণীয়। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল দৈহিক রং বা জন্মের ভিত্তিতে নয়; বরং শারীরিক শক্তি ও মস্তিষ্কের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে মানবসমাজের শ্রেণিবিভাজনের কথা বলেছিলেন। এরিস্টটলের মতে, যেসব মানুষ শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ তারা শ্রেষ্ঠ নয়, বরং তারা কায়িক শ্রম বা দাসত্বের জন্য উপযুক্ত। তার মতে, যারা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তারাই আসলে উন্নত মানুষ।

বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

'মধ্যযুগে এশিয়া ও ইউরোপের মানুষ যখন পশ্চাদপদ আফ্রিকার কালো মানুষদের ধরে নিয়ে দাস ব্যবসা করত, তখন তারা কালোদের দাসত্বের কারণ হিসেবে তাদের কথিত নিকৃষ্ট প্রজাতি হওয়ার কথা বলত। এমনকি, ইবনে খালদুনের মতো খ্যাতনামা মুসলিম দার্শনিকও কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ বলে মর্যাদা দিতে চাননি। যদিও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন কোনো রকম বর্ণবাদ কিংবা জাতিগত বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। মধ্যযুগের মুসলমানদের মধ্যে আফ্রিকার কালো মানুষদের সম্পর্কে এরূপ ধারণার মূল কারণ হলো আর্থিক ও ভূরাজনৈতিক। মুসলিম সাম্রাজ্য আফ্রিকা এমনকি ইউরোপের কিছু অংশে বিস্তৃত হওয়ার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ দাস ও যোদ্ধার প্রয়োজন বেড়েছিল। এছাড়া দাস ব্যবসা ছিল তখনকার বিশ্বের অন্যতম লাভজনক ব্যবসা। মুসলিম পুঁজিপতি ও বণিকরা ইউরোপীয় ও তুর্কি সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশুদ্ধ ইসলামি মূল্যবোধ থেকে সরে গিয়েছিল। চৌদ্দ-পনেরো শতকে সম্ভ্রান্ত আরবীয়রা, নিজেদের শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়েই নয়, বরং সব অনারব মানুষের চেয়েই শ্রেষ্ঠ ভাবতো।

মধ্যযুগে স্পেনীয়রা এই মতবাদ চালু করে যে, অভিজাতদের রক্ত লাল নয়; বরং নীল। তারা এসময় জাতিগত বিশুদ্ধতার ওপর জোর দেয়। স্পেনীয়রা বিশ্বাস করত, সাদা চামড়ার অভিজাতদের রক্ত আসলেই নীল; কারণ তা কালো শ্রেণির মানুষের সাথে মিশে দূষিত হয়ে যায়নি।

বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইউরোপে রেনেসাঁর শেষ দিকে যখন ইউরোপীয় নৌ অভিযাত্রীরা আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করে তখন পর্তুগিজ ক্যাথলিক বিশপদের মধ্যে মার্কিন রেড ইন্ডিয়ানদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে বিতর্ক হয়। ডমিনিকান দার্শনিক জুয়ান গিনেস দি সেপালভেদা বলেন, 'ইন্ডিয়ানরা (মার্কিন আদিবাসী ইন্ডিয়ান) প্রাকৃতিকভাবেই দাস, কেননা তাদের কোনো আত্মা নেই। ফলে ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী তাদের জন্য দাসত্বই উপযুক্ত।' অপরদিকে বার্টোলমি দি লাস কাসাস নামের ক্যাথলিক বিশপ ও দার্শনিক বলেন, 'মার্কিন ইন্ডিয়ানরা প্রাকৃতিকভাবেই মুক্ত মানুষ এবং এ কারণে তারা অন্যান্য স্বাধীন মানুষের মতোই আচরণ পাওয়ার উপযুক্ত।' এভাবে উপনিবেশবাদীরা নিজেদের স্বার্থে খ্রিষ্টধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে আমেরিকার আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন।

প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ মিশেল ফুকো (Michel Foucault)-এর মতে, "বর্ণবাদের প্রকৃত উত্থান ঘটে প্রাক-আধুনিক যুগে যখন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় জাতিভিত্তিক সংগ্রামের বিষয়টি উঠে আসে।" ফুকো আরও বলেছেন, বর্ণবাদ বিষয়টি সর্বযুগে ও সর্বস্থানে জেনোফোবিয়া (Xenophobia) অর্থাৎ বিদেশি বা অজ্ঞাত মানুষের প্রতি বিদ্বেষ হিসেবে বিদ্যমান থাকলেও আধুনিককালে যে Racism (বর্ণবাদ) দেখা দেয় তার উল্লেখ পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের সময়কার এডওয়ার্ড কোক বা জন লিবার্নির লেখনীতে। এ সময় সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় 'বর্ণবাদ' প্রসঙ্গটি ব্যাপকভাবে আসে এবং এর বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা চলে।

বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

উনিশ শতকে বর্ণবাদের জীববিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে Race Science বা Scientific Racism ইত্যাদি শাস্ত্র বিকশিত হয়। এ সময় জাতীয়তাবাদী ধারণা ক্রমেই মানুষের চেতনায়, চিন্তায়, কর্মে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এর ফলে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হতে থাকে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র তার শাসনের বৈধতার ভিত্তি হিসেবে উচ্চ বংশীয় রক্তের দাবি সামনে তুলে ধরে। বিশেষ করে ফ্রান্সের অভিজাতরা তাদের আভিজাত্যের ভিত্তি হিসেবে যুক্তি দেয় যে, তারা বহিরাগত বিজেতা জাতি 'ফ্রাঙ্ক'-এর বংশধর। ফ্রাডিকশরা যেহেতু শ্রেষ্ঠ এবং তাদের মাধ্যমেই ফ্রান্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেহেতু জন্মগতভাবেই তারা তৃতীয় শ্রেণির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ কারণে সব রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা, নেতৃত্ব অভিজাতদের প্রাপ্য। ফরাসী অভিজাতদের দাবি ছিল, থার্ড এস্টেটের মানুষেরা দাসশ্রেণির সাথে সংকরায়নের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। ফলে তারা নিকৃষ্ট।

বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে, পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠী বাঙালি জাতির উৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালানোর পেছনে এই যুক্তি দাঁড় করিয়েছিল যে, বাঙালিরা যেহেতু মূলত নিম্নশ্রেণির হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান সুতরাং তারা খাঁটি মুসলমান নয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্যও এসময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকে 'বর্ণবাদী' বা জাতিভিত্তিক মানবগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতার ধারণার ভিত্তিতে প্যান-জার্মানিজম (Pan-Germanism), জিওনিজম (Zionism), প্যান-তুর্কিজম (Pan-Turkism), প্যান-এরাবিজম (Pan-Arabism) ইত্যাদি ধারণার বিকাশ ঘটে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'জাতিরাষ্ট্র' গঠনের দিকে মোড় নেয়। এর ফলে বিশ শতকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বর্ণবাদের ভয়ংকর রূপ দেখা যায়।

বর্ণবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বিশ শতকের জার্মান একনায়ক এডলফ হিটলার বিশুদ্ধ রক্তের ভিত্তিতে সর্বজার্মানবাদের কথা বলে রাষ্ট্রীয় বর্ণবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি বলতেন, জার্মানরাই খাঁটি আর্য এবং তারা বিশ্বের অন্য সব জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বলদপী, জাত্যাভিমানী হিটলার ও তার তত্ত্বের করুণ পরিণতি ঘটে।
মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হান্নাহ আরেন্ডট (Hannah Arendt) ১৯৫১ সালে The Origins of Totalitarianism গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উনিশ শতকের শেষ দিকে বিকশিত বর্ণবাদী তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদকে আইনগত বৈধতা দান করা। এ তত্ত্বের মাধ্যমে বৈধতা দাবি করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো অনগ্রসর দেশগুলো আক্রমণ করে নির্বিঘ্নে দখলদারিত্ব, হত্যাযজ্ঞ ও শোষণ চালায়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী শাসন স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ তিন শতাব্দী। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ টিকেছে প্রায় দুইশ বছর। বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের ভাষ্য ছিল, অশ্বেতাঙ্গরা যথেষ্ট সভ্য বা নিজেদের শাসন করার যোগ্য নয়। তাদের সভ্যতার আলোতে আনা সুসভ্য ইউরোপীয়দের কাজ। ভারতে জন্ম নেয়া ইংরেজ সাহিত্যিক বুডইয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) তার The White Man's Burden (1899) কবিতায় বর্ণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন ইউরোপীয় সাদা চামড়ার মানুষেরা কীভাবে বিশ্বের সব জাতির ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেছিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০৪ বর্ণবাদী গণহত্যা ও নির্যাতন

বর্ণবাদী গণহত্যা ও নির্যাতন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বর্ণবাদী গণহত্যা ও নির্যাতন

বিংশ শতকে বিশ্বের কয়েকটি দেশে বর্ণবাদী গণহত্যা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দেয়। জার্মানিতে এডলফ হিটলারের নাৎসি দলের সমর্থকরা একমাত্র আর্য ছাড়া অন্য সব মানব গোষ্ঠীকে 'অর্ধ মানব' বলে গণ্য করত। হিটলার বলতেন জার্মানরাই প্রকৃত আর্য। জাতিগত শোধনের নামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নির্দেশে প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। নাৎসিরা ৩ থেকে সাড়ে ৪ কোটি স্লাভকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। হিটলারের এক 'মহাপরিকল্পনা' ছিল যে, ৫ কোটি অজার্মান স্লাভকে বাধ্যতামূলকভাবে উরাল পর্বতের অপর পাড়ে সাইবেরিয়াতে বহিষ্কার করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর পুলিশি নির্যাতন

বর্ণবাদী গণহত্যা ও নির্যাতন

১৯৬২ সালে মিয়ানমারে সামরিক শাসক নে উইন (Ne Win) ক্ষমতায় এসে প্রায় ৩ লাখ ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। ১৯৬৪ সালে আফ্রিকার জাঞ্জিবারে হাজার হাজার ভারতীয় ও আরবীয়কে হত্যা করা হয়। বাঙালিদের স্বাধীনতার দাবিকে স্তব্ধ করতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যা চালিয়েছিল তার মূলেও ছিল জাতিবিদ্বেষ ও এক ধরনের বর্ণবাদী মনোভাব। দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েক শতক ধরে বর্ণবাদী শাসন চলেছে। ১৯৬০ সালে সে দেশের কুখ্যাত শার্পভিল গণহত্যায় অনেক কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করা হয়। কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী থানার বাইরে সমবেত হলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে সরকারি হিসাবেই নারী ও শিশুসহ ৬৯ জন নিহত হয়।

বর্ণবাদী গণহত্যা ও নির্যাতন

১৯৭২ সালে উগান্ডার স্বৈরশাসক ইদি আমিন (Idi Amin) জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের অংশ হিসেবে এশীয়দের দেশ ছাড়ার জন্য ৯০ দিন সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কৃষ্ণাঙ্গদের ওপরও হত্যা-নির্যাতন চালান। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ হিন্দুপ্রধান ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি মানুষ বৈষম্য ও অবহেলার শিকার। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাচীন বর্ণপ্রথার সবার নিচের স্তরে থাকা এই মানুষদের বলা হয় 'অস্পৃশ্য'। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার দৌরাত্ম্য আগের চেয়ে অনেক কমে এলেও এখনো বহু মানুষ নিচু বর্ণে জন্মগ্রহণ করায় বৈষম্য, বঞ্চণা ও নিগ্রহের শিকার হয়ে থাকেন। ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তানে শিয়া মুসলিম এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রায়শই উগ্রপন্থিদের হাতে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়। সেদেশে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতিও বৈরী ভূমিকা পালন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০৫ বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিশ শতকে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। দেশে দেশে এ আন্দোলনে যেসব ব্যক্তি তাদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ডেসমন্ড টুটু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং ভারতের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (মহাত্মা গান্ধী) নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। নিচে এ মহান ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো:

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

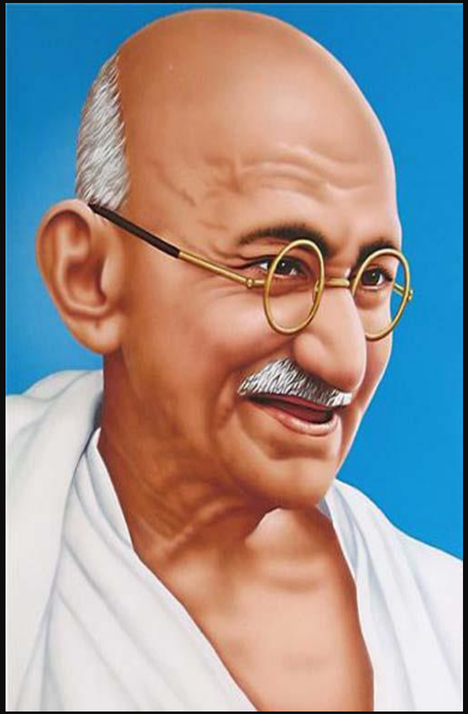

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর বোম্বে প্রেসিডেন্সির কাথিয়াবারের পরবন্দর-এ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন পরবন্দর এস্টেটের একজন দিউয়ান। মাতা পুতলী বাঈ ছিলেন এক বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার সাথে ১৪ বছর বয়সী কস্তুরবা বাঈ মাখানজির বিবাহ হয়।

ম্যাট্রিকুলেশন (বর্তমান এসএসসির সমমান) পাস করার পর ১৮৮৮ সালে গান্ধী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডন পাড়ি দেন। পরে তিনি ভারতে ফিরে এসে জানতে পারেন যে, তার মা আর বেঁচে নেই। কোর্টে উকিল হিসেবে কথা বলতে জড়তা বোধ করায় প্রথমদিকে তিনি বোম্বেতে 'ল প্রাকটিস' করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি রাজকোটে ফিরে গিয়ে মামলার খসড়া লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তার সাথে ভুল বোঝাবুঝির জন্য তার কাজ চলে যায়।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

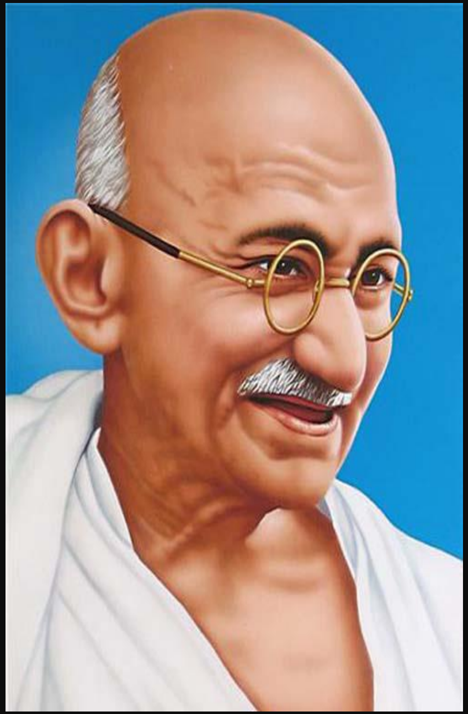

১৮৯৩ সালে মোহনদাস গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাদা আব্দুল্লাহ এন্ড কোম্পানিতে এক বছরের চুক্তিতে চাকুরি নিয়ে 'নাটাল' গমন করেন। ২৪ বছর বয়সে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের আইন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী এ সময় বর্ণবৈষম্যের শিকার হন। তাকে ডাকা হতো 'কুলি ব্যারিস্টার' বলে। এ সময় তার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

শ্বেতাঙ্গশাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী অনেকবার বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার হন। প্রথম শ্রেণির আসন এক শ্বেতাঙ্গ যাত্রীকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করায় তাকে একবার ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছুসংখ্যক হোটেল তাকে প্রবেশ করতে দেয়নি। ডারবানের এক আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পাগড়ি খুলে ফেলতে নির্দেশ দেন, যদিও তিনি তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। এ ঘটনাগুলো তার সামনে বর্ণবাদের কুৎসিত রূপ তুলে ধরে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে গান্ধী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের সঙ্গে সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণবাদী আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ভারতীয় হিন্দু- মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি এক নতুন ধরনের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। সে আন্দোলন ছিল অহিংস অসহযোগের আন্দোলন।

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

গান্ধী ১৯১৫ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে অত্যধিক ভূমিকরের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন। গান্ধীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের কারণে খিলাফত আন্দোলনরত ভারতীয় মুসলমানরাও তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। ১৯২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে গান্ধী দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত ঐক্যগঠন, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তার এসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে স্বরাজ আদায় করা।
১৯৩০ এর দশকে গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ৪০০ কি.মি. দীর্ঘ মার্চ পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় তিনি ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় (Quit India) আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।
মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন, ভারতের প্রাণ হচ্ছে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ। এ জন্য তিনি তার শিষ্য নেহেরুর শিল্পায়ন নীতির সমর্থক ছিলেন না। তিনি গ্রামগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন। আদর্শ স্থাপন করার জন্য নিজে চরকায় সুতা কাটতেন।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

আর্টসকম

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

গান্ধী অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যে ভারতে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-বৌদ্ধ-জৈন সব সম্প্রদায়ের মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে পাশাপাশি বাস করবে। ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চল, দিল্লি, কলকাতা ও নোয়াখালীতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলে তিনি মর্মাহত হন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য তিনি অনশন শুরু করেন। গান্ধী সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নোয়াখালি সফরে এসেছিলেন।

গান্ধী দাঙ্গা বন্ধের আহ্বান জানালে উগ্রপন্থী হিন্দুরা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসে নামে এক উগ্রপন্থী আততায়ী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করে। গান্ধীকে মহাত্মা (Great Soul) উপাধি দিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহাত্মা গান্ধী ভারতের জাতির পিতা। দেশবাসী শ্রদ্ধা করে তাকে 'বাপুজী' সম্বোধন করে।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮)

যেসব ক্ষণজন্মা মহামানব বিশ্ব সভ্যতাকে ক্লেদমুক্ত করার প্রয়াসে জীবন উৎসর্গ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন যাজক। আফ্রিকান-আমেরিকান নাগরিক অধিকার আদায়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় ১৯২৯ সালের ১৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল মাইকেল কিং (Michael King)। কিন্তু ১৯৩৪ সালে জার্মানির বার্লিনে ৫ম ব্যাপটিস্ট ওয়ার্ল্ড এলায়েন্স কংগ্রেস এ যোগদানের জন্য তার বাবা নিজের ও তার নাম পরিবর্তন করেন। পরবর্তীতে মহান জার্মান ধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথার কিং-এর সম্মানে নিজের নামটিও অনুরূপ রাখাকে তিনি শ্রেয় মনে করেন।

বাল্যকাল থেকেই মার্টিন লুথার কিং বাইবেলের বহু বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি যখন 'সানডে স্কুলে' যেতেন, সেখানে যিশুখ্রিষ্টের কবর থেকে শারীরিকভাবে পুনরুত্থান হওয়ার ঘটনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮)

তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। বুকার টি ওয়াশিংটন বিদ্যালয়ে (Booker T. Washington High School) পড়ার সময় তিনি নবম ও দ্বাদশ গ্রেড না পড়েই মাত্র ১৫ বছর বয়সে মোরহাউজ কলেজে (Morehouse College) ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

১৯৪৮ সালে তিনি উক্ত কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞানে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯৫৪ সালে কিং মন্টগোমারীর ডেক্সটার এভিনিউ ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক (Pastor) পদ অলংকৃত করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮)

মার্টিন লুথার মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ জন্য ১৯৫৯ সালের এপ্রিলে ভারত সফর করে গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভকরেন। এরপর তিনি আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনে এ ধরনের আন্দোলন কৌশল প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের 'প্লেবয়' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে কিং উল্লেখ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো চামড়ার মানুষদের সাদা চামড়ার মানুষদের মতো সমানাধিকার প্রদানই যথেষ্ট হবে না। বরং সাদা চামড়ার মানুষরা ব্ল্যাক আমেরিকানদের পূর্বপুরুষদের আফ্রিকা থেকে দাসত্বের জন্য আমেরিকায় ধরে এনে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তিনি দাবি করেন, সরকারকে একটি ক্ষতিপূরণ প্রকল্প চালু করে দশ বছরব্যাপী ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার আফ্রিকান, আমেরিকান এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে। তিনি এ ধারণাকে একটি সাধারণ আইনের মতো করে দরখাস্তাকারে উপস্থাপন করেছিলেন এবং এটাও নিশ্চিত করেছিলেন যে, এ পরিমাণ অর্থ অতীতে তাদের অপরিশোধিত শ্রমের জন্যই প্রতিদান হিসেবে দিতে হবে এবং তা শুধু কালোদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নয়, সকল সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জাতি বা গ্রুপের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮)

১৯৫৫ সালে রোজা পার্কস (Rosa Parks) নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা বাসে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত আসনে বসে ভ্রমণ করার ফলে তৎকালীন 'Jim Crow Laws' আইন ভঙ্গ করার অপরাধে সরকার তাকে গ্রেফতার করলে মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে মন্টগোমারিতে বাস ধর্মঘট শুরু হয়। এ ধর্মঘট স্থায়ী হয় ৩৮৫ দিন। এ আন্দোলন চলাকালে বোমা মেরে কিং-এর বাড়ির একাংশ উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট মন্টগোমারির সরকারি বাসে সকল প্রকার বর্ণবাদী শ্রেণিবিভেদ অবৈধ ঘোষণা করে। এ ঘটনার পর তিনি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের জাতীয় নেতায় পরিণত হন।

মার্টিন লুথার কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার, শ্রম অধিকার, শ্রেণিবৈষম্য বিরোধী আইনের দাবি ইত্যাদি আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেন। ফলে ১৯৬৪ সালের নাগরিক অধিকার আইনে এসব দাবির অনেকগুলোই পূরণ করা হয়।

১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিং 'স্বাধীনতা ও চাকুরির জন্য ওয়াশিংটন অভিমুখে যাত্রা' আন্দোলনে লিংকন মেমোরিয়াল-এর সামনে ১৭ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটির নাম ছিল, 'I have a dream.' এ ভাষণটি সম্ভবত আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষণ। ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল ভোরবেলা দ্য লরেইন মোটেলের বেলকনিতে দাঁড়ানো অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে এই মহান মনীষীর জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)

নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তি। তার পুরো নাম নেলসন রোলিহলাহলা ম্যান্ডেলা। তিনি ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশের উমতাতার মভেজু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার গোত্রীয় নাম মাদিবা। তার পরিবারে তিনিই প্রথম বিদ্যালয়ে গমন করেন। তিনি যখন প্রথম বিদ্যালয়ে যান তখনকার ব্রিটিশ প্রথানুযায়ী স্কুল টিচার মিস মডিনজেন তার একটি নতুন নাম 'নেলসন' (Nelson) প্রদান করেন। তার পিতা গাডলা হেনরি মফাকানিসওয়া ছিলেন সেই প্রদেশের সম্রাটের কাউন্সিলর ও স্থানীয় প্রধান। ম্যান্ডেলার মা নোসেকেনি ফ্যানি ছিলেন প্রভাবশালী জোসা (Xhosa) গোত্রের মেয়ে।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)

ম্যান্ডেলার বাল্যকাল কাটে পশুপালক রাখালদের সাথে। যদিও তার পিতা-মাতা উভয়েই নিরক্ষর ছিলেন, তার মা একজন খ্রিষ্টান ভক্ত হিসেবে তাকে সাত বছর বয়সে স্থানীয় মেথডিস্ট খ্রিষ্টান স্কুলে ভর্তি করান। তার নয় বছর বয়সে তার বাবা ফুসফুসজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর তার মা তাকে জংগিনতাবা ডালিনদায়েবুর (যিনি রাজকীয় রিজেন্ট ছিলেন) অভিভাবকত্বে প্রেরণ করেন। জংগিনতাবা এবং তার স্ত্রী ম্যান্ডেলাকে তাদের পুত্রসম দেখাশোনা করেন। তাকে প্রাসাদ সংলগ্ন গির্জায় ভর্তি করা হয় যেখানে তিনি প্রতি রবিবার খ্রিষ্টীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য যেতেন। তিনি স্থানীয় মেথোডিস্ট মিশনারি স্কুলে ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোলের ওপর পাঠ গ্রহণ করেন।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)

তিনি থেম্বু রয়েল হাউসের প্রিভি কাউন্সিলর পদে উপযুক্ত হওয়ার জন্য ব্ল্যাক আফ্রিকান থাম্বুল্যান্ডের বিখ্যাত মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'Clarkebury Boarding Institute' এ ভর্তি হন। এখানে দু'বছরের পাঠ শেষ করে তিনি ১৯৩৭ সালে হিল্ডটাউন মেথডিস্ট কলেজে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি ইউনিভার্সিটি অব ফোর্ট হেয়ার এ ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি লাভের জন্য ভর্তি হন। সেখানে তিনি ইংরেজি, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, স্থানীয় প্রশাসন, রোমান ও ডাচ আইন অধ্যয়ন করেন। এখানে প্রথম বর্ষ শেষে, খাদ্যের মান সংক্রান্ত এক ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার অপরাধে তাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হলে বিনা ডিগ্রিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)

বাড়ি ফিরে তিনি জানতে পারেন যে, জংগিনতাবা তার বিবাহের বন্দোবস্ত করেছেন। ফলে তিনি পালিয়ে জোহানসবার্গে চলে আসেন এবং ক্রাউন মাইনসে নৈশ প্রহরীর চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে তিনি বেশিদিন টিকতে পারেননি। এরপর তিনি তার চাচাতো ভাইয়ের সহায়তায় স্থানীয় এএনসি (ANC) দলের কর্মী ওয়াল্টার সিসুলুর সংস্পর্শে আসেন। সিসুলু তাকে এক 'ল' ফার্মের কেরানির চাকুরি পাইয়ে দেন। এ ফার্মে ম্যান্ডেলা গাউর বেদেবে নামের একজন কমিউনিস্ট নেতা এবং ন্যাট ব্রেগম্যান নামে শ্বেতাঙ্গ ইহুদি কমিউনিস্ট নেতার সংস্পর্শে আসেন। এদের সাথে সমাজতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনায় অংশ নিয়ে ম্যান্ডেলা লক্ষ করলেন যে, এখানে ইউরোপিয়ান, আফ্রিকান, ইন্ডিয়ানসহ শ্বেতাঙ্গরা একত্রে কাজ করছে। তবে তিনি এ দলে যোগ দেননি। কেননা, এরা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী ছিল আর তিনি খ্রিষ্টীয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া তার মনে হয়েছিল, আফ্রিকায় যে সংগ্রাম চলছে তা বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রাম, এটা শ্রেণিসংগ্রাম নয়।

১৯৪৩ সালে তিনি বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আহূত এক সফল ধর্মঘটে অংশ নেন। এ সময় তিনি বিএ ডিগ্রি লাভের জন্য ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকায় নৈশ শিফটে ভর্তি হন। বিএ ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি জোহানসবার্গে ফিরে এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার অভিপ্রায়ে স্বাধীন আইন পেশায় যোগ দেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)

১৯৪৩ সালে ম্যান্ডেলা এন্টন লেমবেডের সাথে দেখা করেন যিনি কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সাথে গণসম্পৃক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এর যুব শাখা গঠনের জন্য তিনি এএনসি'র প্রেসিডেন্ট আলফ্রেড বিটিনি ঝুমা'র সাথে তার সোফিয়া টাউনস্থ বাসায় সাক্ষাৎ করেন।

১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এলে তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ট্রান্সভাল শাখার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদে আইনি লড়াই অব্যাহত রাখা এবং এএনসি'র নেতৃত্বের কারণে বারবার তিনি গ্রেফতার হন, কারাবরণ করেন। ১৯৫৬-১৯৬১ সাল পর্যন্ত তাকে কারাগারে রেখে তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা চালায় তৎকালীন বর্ণবাদী সরকার। কিন্তু প্রমাণ করতে না পেরে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬১ সালে সরকারি লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবাজির অভিযোগে তাকে ১৯৬২ সালে গ্রেফতার করা হয়। রিভোনিয়া ট্রায়ালে (Rivonia Trial) তাকে সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার অভিযোগে এবং সরকার উৎখাতের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২৭ বছর কারাবাস শেষে ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তিলাভ করেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)

১৯৯৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি একটি জাতীয় সরকার গঠন করেন। ১৯৯৯ সালে প্রথম মেয়াদের প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন শেষে ম্যান্ডেলা দ্বিতীয় মেয়াদে আর নির্বাচন করেননি। দক্ষিণপন্থি সমালোচকরা তাকে একজন সন্ত্রাসী এবং কমিউনিজমের প্রতি অনুরক্ত বলে অভিযুক্ত করলেও বিশ্বব্যাপী তিনি বর্ণবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নায়ক হিসেবে নন্দিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি 'মাদিবা' বা জাতির জনক হিসেবে পরিচিত। তার জীবন ও যৌবনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদমুক্ত হয়েছে।

১৯৯৩ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নেলসন ম্যান্ডেলা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনি এইডসবিরোধী এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। ২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ৯৫ বছর বয়সে এই মহামানব পৃথিবীর. কোটি মানুষের হৃদয় শূন্য করে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেন।

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

ডেসমন্ড টুটু (১৯৩১-২০২১)

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের আরেক দিকপাল হলেন ডেসমন্ড মপিলো টুটু (Desmond Mpilo Tutu)। তিনি ১৯৩১ সালের ৭ অক্টোবর ট্রান্সভালের ক্লার্কসডর্পে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে ধর্মযাজক টুটু বিশ্বব্যাপী পরিচিত মূলত একজন সামাজিক ও মানবাধিকার কর্মী হিসেবে। তিনি প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে জোহানেসবার্গের বিশপ ও কেপটাউনের আর্চবিশপ হয়েছিলেন। ১৯৮০'র দশকে তিনি বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

টুটুর বাবা জাকারিয়া জিলিলো টুটু ছিলেন একজন শিক্ষক এবং মা আলেট্টা ছিলেন অন্ধদের স্কুলের রাঁধুনি ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী। ডেসমন্ড টুটু চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় তিনি পিতার পথ অনুসরণ করে শিক্ষকতায় যোগ দেন। টুটু ১৯৫১-৫৩ সময়কালে বান্টু নরমাল কলেজে অধ্যায়ন শেষে জোহানসবার্গে বান্টু হাইস্কুল এবং মগিলা সিটিতে মুনসিয়েনভিলি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। বান্টু এডুকেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য দুর্বল শিক্ষাপদ্ধতি চালু ছিল। টুটু বিষয়টি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেন।

ডেসমন্ড টুটু (১৯৩১-২০২১)

এরপর তিনি জোহানসবার্গের সেন্ট পিটার্স থিওলজি কলেজে ধর্মতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা করেন। এসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বর্ণবাদী শাসনব্যবস্থা ও নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হতে থাকে। তবে ছাত্রাবস্থায় টুটু এসব আন্দোলন বিক্ষোভে যোগ দেননি। ১৯৬০ সালে যাজক পদে অভিষিক্ত হন টুটু। ১৯৬২-৬৬ সময়কালে তিনি লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে ধর্মতত্ত্বের ওপর ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডনে অবস্থানকালে টুটুর মন থেকে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বিরাগ এবং কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে হীনম্মন্যতা দুটোই কমে যায়।

ডেসমন্ড টুটু (১৯৩১-২০২১)

পড়াশোনা শেষে লন্ডন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসেন টুটু। ১৯৬৭থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি দেশের সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থার ওপর সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অব ফোর্ট হেয়ার এর চ্যাপলিন (যাজকের একটি পদ) হন। সেখানে অবস্থানকালে সরকারের বর্ণবাদী নীতির সমালোচনা করেন। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্রদের এক প্রতিবাদে যোগ দিয়ে প্রার্থনা করেন টুটু। ১৯৭০-৭২ সময়কালে তিনি প্রতিবেশী লেসোথোর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক ছিলেন। ১৯৭২ সালে টুটু ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা তহবিল (টিইএফ) এর ভাইস-ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়ে আবার যুক্তরাজ্যে যান। এর সদর দপ্তর ছিল দক্ষিণ লন্ডনের ব্রমলিতে। ১৯৭৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি জোহানসবার্গের সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালের ডিন হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। ঐ পদে তিনিই ছিলেন প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ।

ডেসমন্ড টুটু ও নেলসন ম্যান্ডেলা

বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

আর্টসকম

ডেসমন্ড টুটু (১৯৩১-২০২১)

কর্মসূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরেছেন ডেসমন্ড টুটু। অমানবিক বর্ণবাদী শাসনের যাতাকলে পিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গদের দুর্দশা নিজের চোখে দেখেছেন। এ ছাড়া বিশ্বের দেশে দেশে ঘুরে নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের কথা শুনেছেন। এভাবে তিনি একসময় দক্ষিণ আফ্রিকার গণ্ডী ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বের গণমানুষের অধিকারের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। টুটুকে বলা হয় 'দক্ষিণ আফ্রিকার বিবেক'। বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তার সম্পর্কে বলেন, 'Desmond Tutu's voice will always be the voice of the voiceless' (যাদের কথা বলার কেউ নেই ডেসমন্ড টুটু চিরদিনই তাদের হয়ে কথা বলে যাবেন)।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনামলে ডেসমন্ড টুটু তার উচ্চ ধর্মীয় পদবিকে ব্যবহার করে নির্যাতিতদের পাশে এসে. দাঁড়াতেন। বর্ণবাদ ছাড়াও এইডস, যক্ষ্মা, দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি মোকাবেলার লড়াইতে যোগ দিয়েছেন তিনি। ১৯৮৪ সালে টুটুকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। আমৃত্যু তিনি বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কাজ করে গেছেন তার বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনীর মাধ্যমে। ২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে এই বিশ্ববরেণ্য বর্ণবাদ বিরোধী নেতার মৃত্যু হয়। আজীবন আপসহীন, সংগ্রামী ও স্পষ্টভাষী এ নেতার বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই বিশ্বের অগণিত মানুষকে পথ দেখিয়ে গেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০৬ বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

মার্টিন লুথার কিং-এর বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলন
(Anti-Racism Movement of Martin Luther King jr.)

মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি এক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত 'কালো মানুষদের' প্রতি মার্কিন সমাজ ও রাষ্ট্র যে পদ্ধতিগত বৈষম্য ও অবিচার করে আসছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন মার্টিন লুথার কিং। তার এ আন্দোলন ১৯৫০-এর দশকে শুরু হয়েছিল।

মার্কিন সংবিধান অনেক আগেই দাস প্রথা বিলুপ্ত করা সত্ত্বেও সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে বর্ণবাদ বিরাজ করছিল। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই কৃষ্ণাঙ্গদের বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হতে হতো। 'জিম কো ল' নামে পরিচিত আইনের কারণে কৃষ্ণাঙ্গদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে পৃথক থাকতে হতো। গণপরিবহনে চলাচল, পাবলিক টয়লেট ব্যবহার, রেস্তোরাঁয় খাওয়া বা সিনেমা-নাটক দেখার মতো বহু ক্ষেত্রে সাদা ও কালোদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতো। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো সেগ্রিগেশন। এমনকী কারাগারেও সাদা ও কালো বন্দিদের পৃথক রাখা হতো।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্যের মন্টগোমারি শহরে রোজা পার্কস (Rosa Parks) নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা প্রচলিত আইন মেনে এক শ্বেতাঙ্গকে বাসের আসন ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন। রোজা পার্কসকে টেনে বাসের বাইরে ফেলে দেয়া হয়। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার এবং দশ ডলার জরিমানা করে। এঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা এর প্রতিবাদে মন্টগোমারিতে একদিনের বাস বয়কট কর্মসূচি ডাকে।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

তবে কৃষ্ণাঙ্গদের ঐ বাস বয়কট শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ এক বছর স্থায়ী হয়। শেষ পর্যন্ত অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্যের সরকার বাসে পৃথক আসনের প্রথা বাতিল করলে মার্টিন লুথার কিংয়ের নাগরিক অধিকার আন্দোলনে প্রথম সাফল্য আসে। এ আন্দোলনে লুথার কিং অসামান্য নেতৃত্ব দেন এবং দেশজুড়ে কালো মানুষদের জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হন। এরপর ১৯৫৭ সালে আরকানসাস অঙ্গরাজ্যের লিটল রকের স্কুলে বর্ণের ভিত্তিতে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের ফলে আদালত বিদ্যালয়গুলোতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের নিরিখে পৃথক রাখার প্রথা বাতিল করে। মার্টিন লুথার কিংয়ের নেতৃত্বে ১৯৬০-এর দশকে 'নাগরিক অধিকার আন্দোলন' ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এর অংশ হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট, প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি করা হয়। এ আন্দোলনের সময় হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু আন্দোলন দমন করা যায়নি।

প্রায় ২৫ বছর ধরে মার্টিন লুথার কিংয়ের নাগরিক অধিকার আন্দোলন চলে। এতে উৎসাহিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বর্ণবাদবিরোধী সংগঠন গড়ে ওঠে। এ আন্দোলনের ফলে অবশেষে মার্কিন সমাজ ধীরে ধীরে বর্ণবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। ১৯৬৪ সালের সিভিল রাইটস অ্যাক্ট ও ১৯৬৫ সালের ভোটিং রাইটস অ্যাক্টের মতো আইন বর্ণের ভিত্তিতে পৃথককরণসহ অন্যান্য বৈষম্য অবসানের পথ প্রশস্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৮ সাল নাগাদ সব ধরনের পৃথকীকরণকে অসাংবিধানিক বলে রায় দেয়। ধীরে ধীরে স্কুল, সশস্ত্রবাহিনী, গৃহায়নসহ সব সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য করা অবৈধ ঘোষিত হয়।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

বঙ্গবন্ধুর বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলন (Anti-Racism Movement of Bangabandhu)

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশে পড়ে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিচয় হয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের ক্ষমতার রাশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকদের হাতে। বাঙালিরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলেও পাকিস্তানি শাসকরা তাদের সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। সরকারি চাকরি, সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রবেশ ব্যাপকভাবে সংকুচিত করা হয়। পাকিস্তানি রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের অনেকেই বাঙালিদের জাতি হিসেবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন। এমনকি তারা ভূত-প্রেতের সমতুল্য- এমন ভাষাও ব্যবহার করা হতো। মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ায় বাঙালি মুসলমানদের তারা নিম্নমানের মুসলিম হিসেবেও আখ্যায়িত করতেন।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হত্যা-নির্যাতন চালানোর জন্য পাকিস্তানি সেনাদের ওপর বিশেষ নির্দেশ ছিল। অর্থাৎ এখানে জাতিগত বিদ্বেষের বিষয়টি মুখ্য ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতি' হিসেবে বাঙালির মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালে বাঙালিদের ওপর বর্বর গণহত্যা চালায়। তবে তারা 'জাতি' হিসেবে বাঙালিকে দমাতে পারেনি।

নয়মাস যুদ্ধের পর একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও জাতিগত বিদ্বেষমূলক আচরণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সে হিসেবে দেখলে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টাকে বৈশ্বিক বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অংশ তথা অন্যতম মাইলফলক বলা যেতে পারে।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন (Satyagraha Movement led by Mahatma Gandhi)
বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের আরেক দিকপাল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)। তিনি কর্মসূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ সচক্ষে দেখেন। গান্ধী নিজেও সেখানে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হন। এক পর্যায়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয় অভিবাসী ও স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যোগ দেন।
১৯০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে প্রাদেশিক সরকার এশীয় নাগরিকদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। এশীয় অধিবাসীদের অবাধে চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং স্থায়ীভাবে সম্পত্তি ভোগ-দখলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এশিয়াটিক অর্ডিন্যান্স (Asiatic Ordinance) বা (Transvaal Asiatic Law Amendment Act) নামে জরুরি আইন পাশ করে বর্ণবাদী সরকার। এই আইন পাশ হলে মহাত্মা গান্ধী প্রতিবাদ করেন। তিনি ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ উপনিবেশিক সেক্রেটারির সাথে দেখা করে এ আইন পাশের নিন্দা জানান এবং প্রতিকার দাবি করেন।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে এসে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার রক্ষায় 'সত্যাগ্রহ আন্দোলনের' সূচনা করেন। ১৯০৬ সালে গান্ধী'র সত্যাগ্রহ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অহিংস উপায়ে সত্যের পথ অবলম্বন করা। এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯০৮ সালে মহাত্মা গান্ধীকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়। বর্ণবাদী সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯০৬-১৯১৪ সময়কালে 'সত্যাগ্রহ আন্দোলন' গড়ে তোলেন। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার প্রণীত 'Black Ordinance' এর বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ ও এশীয়দের নিয়ে তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই 'কালো আইনে' বলা হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে বসবাসরত এশীয়দের নিজেদের হাতের ছাপ দ্বারা নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত সনদ পুলিশকে চাওয়া মাত্র দেখাতে বাধ্য থাকবে। অনিবন্ধিত ব্যক্তিদের ট্রান্সভালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং কোনো আদালতে এর বিরুদ্ধে আবেদন জানানোর অধিকার হরণ করা হয়।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধী এই কালো আইনের অবসানের জন্য নির্যাতিত ভারতীয় এবং স্থানীয় বহু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের নিয়ে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন। এই অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তীব্রতার ফলে এশীয়দের প্রতি বর্ণবাদী সরকারের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা কমে আসে। শ্বেতাঙ্গ সরকার 'কালো আইন' বাতিল করতে বাধ্য হয়। ১৯১৪ সালে শ্বেতাঙ্গ সরকার 'The Black Ordinance' তুলে নিতে বাধ্য হয়।

মহাত্মা গান্ধীর এই আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও এশীয়দের মধ্যে পরবর্তীতে সচেতনতার সৃষ্টি করেছিল এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাহস জুগিয়েছিল।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

নেলসন ম্যান্ডেলার বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলন (Anti-Racism Movement of Nelson Mandela)

নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন আফ্রিকার কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের পক্ষে মহান পুরুষ। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতকায় মানুষগুলো দক্ষিণ আফ্রিকাকে দখল করে উপনিবেশ বানিয়ে এর জনগণকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করছিল। এই চারটি ভাগ হলো: ১. আফ্রিকান (জার্মান ভাষী); ২. কালো; ৩. শ্বেতাঙ্গ ও ৪. ইন্ডিয়ান। শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্যেরা ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারতো না। তাছাড়া 'Homeland System' আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের বসবাসের পৃথক স্থান নির্বাচন করা হতো এবং অনেক সময় এ জন্য কালোদের বাস্তুচ্যুত করা হতো। কালোদের সব ধরনের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। ১৯৫৫ সালে নেলসন ম্যান্ডেলা একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে কালোদের ওপর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

পঞ্চাশের দশকে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তারা দমে যাননি। তাদের তীব্র আন্দোলনে ১৯৬০ সালে শার্পেভিল (Sharpeville) শহরে ৭০০০ আন্দোলনকারীর ওপর পুলিশ গুলি ছুঁড়লে ৬৯ জন মৃত্যুবরণ করেন। এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য ম্যান্ডেলা বিশ্বব্যাপী সফর করেন এবং আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রজ্জু করে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। তিনি ২৭ বছর কারাবরণ করেন। এ কারাভোগের ১৮ বছরই তিনি ছিলেন রোনে দ্বীপ কারাগারে। কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ আন্দোলন করে বর্ণবাদকে উচ্ছেদ করেছে। অবশেষে ১৯৯০ সালে নেলসন ম্যান্ডেলা জেল থেকে মুক্তি পান।

বর্ণবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন

বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সফলতা (Success of Anti-Racism Movement)

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বিরোধী অসংখ্য আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। এসব আন্দোলনের ফলেই বিশ্ব আজ অনেকটা বর্ণবাদমুক্ত। বর্ণবাদের ভয়াল থাবায় জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থান হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে সব ধরনের বর্ণবাদী বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং এবং অন্যান্য নাগরিক অধিকার কর্মীদের আন্দোলনের ফলে সাদা চামড়ার মানুষ এবং কালো চামড়ার মানুষেরা আজ প্রায় প্রতিটি স্টেটেই একই রকম ভোটাধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, স্বাস্থ্য সুবিধাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৯০-এর দশকে তীব্র আন্দোলনের ফলে বর্ণবাদী আইনসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে। সেখানে আজ সাদা-কালোর সুযোগ-সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য নিরসনের ক্ষেত্রে আইন যথেষ্ট কার্যকর। ভারতে যদিও দলিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু সংবিধানে তাদের মানুষ হিসেবে সব অধিকার স্বীকৃত। ইউরোপীয়দের 'Supremacism'-এর ধারণা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে দেশে বর্ণবাদ বিরোধী আইনকানুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই এ ধরনের নেতিবাচক মূল্যবোধ দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য নিরন্তর পঠন-পাঠন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিবেককে জাগ্রত রাখা খুবই প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. Racism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী?

ক. সুফিবাদ খ. বর্ণবাদ গ. সাম্রাজ্যবাদ ঘ. মতবাদ

২. ভারতে কোন সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলা হয়?

ক. দলিত খ. ব্রাহ্মণ গ. ক্ষত্রিয় ঘ. আর্য

৩. নিচের কোন নরগোষ্ঠী বেশি বর্ণবৈষম্যের স্বীকার?

ক. ককেশয়েড খ. অস্ট্রালয়েড গ. মঙ্গোলয়েড ঘ. নিগ্রোয়েড

৪. "গ্রিকরা যেমন প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন তেমনি বর্বররা স্বাভাবিকভাবেই দাসত্বের জন্য উপযুক্ত"- উক্তিটি কার?

ক. এরিস্টটলের খ. জো ফ্যাগিনের গ. স্যানডারসনের ঘ. ডেভিড ওয়েলম্যানের

৫. সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কয়টি দিক রয়েছে?

ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৬. মহাত্মা গান্ধীর পিতার নাম কী?

ক. করমচাঁদ গান্ধী খ. রাজীব গান্ধী গ. মহাত্মা গান্ধী সিনিয়র ঘ. দালাইলামা গান্ধী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭. মহাত্মা গান্ধীর জনসচেতনতামূলক কাজের উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. স্বরাজ আদায় করা
খ. ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী করা
গ. ভারতে ইউরোপীয় শাসন স্থায়ী করা
ঘ.. ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করা

৮. মহাত্মা গান্ধী কোথায় বর্ণবাদের বা বর্ণ বৈষম্যের শিকার হন?
ক. ব্রিটেনে খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ. ফ্রান্সে ঘ. আফ্রিকায়

৯. কত সালে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৯২৭ খ. ১৯২৮ গ. ১৯২৯ ঘ. ১৯৩০

১০. কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
ক. মার্টিন লুথার কিং খ. রুজভেল্ট গ. উ থান্ট ঘ. দ্যাগ হেমারশোল্ড

১১. দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার কত সালে Apartheid নীতি গ্রহণ করে?
ক. ১৯৪০ খ. ১৯৪২ গ. ১৯৪৪ ঘ. ১৯৪৮

১২. নেলসন ম্যান্ডেলা কত সালে আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন?

ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯২ গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৪

১৩. দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ সংক্রান্ত আইন কী নামে পরিচিত?

ক. Three Pillars খ. Four Pillars গ. Five Pillars ঘ. Seven Pillars

১৪. নেলসন ম্যান্ডেলা কত সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯২ গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৪

১৫. কত সালে ডেসমন্ড টুটু জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১৯৩০ খ. ১৯৩১ গ. ১৯৩২ ঘ. ১৯৩৩

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯ – বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ভারতে বৈদিক পরবর্তী যুগে সমাজে শ্রেণিভেদ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করে। ব্রাহ্মণরা উঁচু শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় অপর শ্রেণির মানুষদের ভিন্ন চোখে দেখত। বিশেষত বৈশ্য ও শুদ্র শ্রেণির মানুষদের তারা মানুষই মনে করত না। এদের সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করত না। [সকল বোর্ডে ২০১৮]

ক. নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মস্থান কোথায়?

খ. অহিংস আন্দোলন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সাথে আফ্রিকায় প্রচলিত কোন বিষয়ের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উক্ত ব্যবস্থা আফ্রিকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল'-উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো।

সুদীর্ঘকাল ধরেই ইউরোপীয়রা 'Y' দেশের লোকদের ঔপনিবেশিক শাসনে নিষ্পেষিত করছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অপমানিত ও বঞ্চিত করছে। এ অমানবিক নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে এক মহান ও অবিসংবাদিত সংগ্রামী নেতার নেতৃত্ব ঐ দেশের জঘন্য নীতির মৃত্যু নিশ্চিত করে। জয় হয় কালো মানুষের।

[ব. বো., সি. বো., য. বো, কু. বো., দি. বো ২০১৭]

ক. মহাত্মা গান্ধী কে ছিলেন?

খ. স্নায়ুযুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উল্লিখিত নেতার কার্যকলাপ তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? বিশ্লেষণ করো।

জুয়েলের গায়ের রং ফর্সা, তমালের গায়ের রং কালো। একারণে জুয়েল তমালকে ঘৃণার চোখে দেখে। জুয়েল মনে করে তমালের পূর্বপুরুষ নীচু জাতের, এ জন্যই তমালের গায়ের রং কালো। [সকল বোর্ড ২০১৯]

ক. মার্টিন লুথার কিং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. ফ্রান্সে কীভাবে জাতিগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়?

গ. উদ্দীপকের বিষয়টি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? কেন এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল?

ঘ. তুমি কি মনে কর, "উক্ত ধারণার জন্য অনেক দেশে সংঘাত হয়েছিল"? মতামত দাও।

THANK YOU